যায়যায়দিন

তারিখঃ ২১/১১/২০২৫ (পৃষ্ঠাঃ০৩)

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট

খাদ্য নিরাপত্তায় ধান গবেষণার গৌরবময় সাড়ে পাঁচ দশক

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। ধান এ দেশের মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য। দেশের গ্রামীণ অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, সামাজিক স্থিতিশীলতা- এমনকি সংস্কৃতির সঙ্গেও ধান নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। কিন্তু স্বাধীনতার আগে এই ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বনির্ভর ছিল না। খাদ্য ঘাটতি মেটাতে বিদেশ থেকে নিয়মিত চাল আমদানি করতে হতো। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি জমির সীমাবদ্ধতা এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে খাদ্য নিরাপত্তা তখন ছিল দেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। স্বাধীনতার পর এই পরিস্থিতি বদলাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট বা ব্রি। ধানের নতুন জাত উন্নয়ন, কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন, যান্ত্রিকীকরণ এবং কৃষকবান্ধব গবেষণার মাধ্যমে ব্রি আজ শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বমঞ্চেও ধান গবেষণার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃত। ১৯৭০ সালের ১ অক্টোবর ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট। স্বাধীনতার পর ১৯৭১ সালে এর নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট। সংসদীয় আইনের মাধ্যমে ১৯৭৩ সালে এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠে। বর্তমানে ব্রি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি অন্যতম স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের (NARS) অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ব্রি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবন এবং কৃষকদের হাতে নতুন প্রযুক্তি পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করে আসছে। ব্রি'র এই দীর্ঘ পথচলা নিয়ে আজ জানাচ্ছেন নূরে আলম

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মুল ফটক

প্রতিষ্ঠালগ্নে ব্রি'র কার্যক্রম সীমিত ছিল। কয়েকটি গবেষণা বিভাগ এবং হাতেগোনা কিছু বিজ্ঞানী নিয়ে কাজ শুরু হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রি প্রসারিত হয়েছে। এখন সদর দফতরে রয়েছে ১৯টি গবেষণা বিভাগ, ২০টিরও বেশি আধুনিক গবেষণাগার, উন্নতমানের জার্মপ্লাজম ব্যাংক, গ্রিন হাউস, নেট হাউস এবং ৭৬ একরেরও বেশি পরীক্ষণ মাঠ। সারা দেশে ১৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় এবং ছয়টি স্যাটেলাইট স্টেশনের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে এখানে ৩১৮ জন বিজ্ঞানীসহ ৮০০ জনেরও বেশি কর্মকর্তা-কর্মচারী কাজ করছেন, যাদের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশে উচ্চতর ডিগ্রিধারী।

ধান গবেষণায় ব্রি'র সবচেয়ে বড় অবদান হলো- নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন। এ পর্যন্ত ব্রি উদ্ভাবন করেছে ১২১টির বেশি উচ্চ ফলনশীল আধুনিক জাত। এর মধ্যে রয়েছে- ১১৩টি ইনব্রিড এবং আটটি হাইব্রিড জাত।

বাংলাদেশের ভৌগলিক বৈচিত্র্য যেমন- উত্তরে খরা, দক্ষিণে লবণাক্ততা, মধ্যাঞ্চলে বন্যা ও জলমগ্নতা-এসব প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবিলায় ব্রি উদ্ভাবন করেছে লবণাক্ত সহনশীল, খরা সহনশীল, জলমগ্নতা সহনশীল, ঠান্ডা সহনশীল, জোয়ার-ভাটা সহনশীলসহ বিভিন্ন ধরনের ৩৭টি জাত। শুধু প্রতিকূল পরিবেশ সহনশীলতাই নয়, ২৭টি পুষ্টিসমৃদ্ধ ও ১৪টি সরু ও সুগন্ধি চালের ধানও উদ্ভাবন করেছে ব্রি। যেগুলো আন্তর্জাতিক বাজারে রফতানিযোগ্য। বিশ্বের প্রথম জিঙ্ক সমৃদ্ধ ধান ব্রি ধান৬২সহ সাতটি জিঙ্ক সমৃদ্ধ জাত উদ্ভাবন করে বাংলাদেশকে বিশ্বে গৌরবময় অবস্থানে নিয়ে যায়। বর্তমানে জিঙ্ক, আয়রন, প্রোটিন সমৃদ্ধ জাত কৃষকের হাতে পৌঁছেছে।

স্বাধীনতার পূর্বে ১৯৭০ সালে বাংলাদেশে ধান উৎপাদন ছিল মাত্র ৯৭ লাখ মেট্রিক টন। কিন্তু বর্তমানে সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় চার কোটি টনে। এই উৎপাদন বৃদ্ধির পেছনে ব্রি উদ্ভাবিত জাতের অবদান প্রায় ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ। বর্তমানে দেশের মোট ধান জমির ৭৫ শতাংশে ব্রি উদ্ভাবিত জাত চাষ করা হয়। বোরো মৌসুমের ধানের ৮২ শতাংশ, আউশ মৌসুমের ৩৬ শতাংশে এবং আমন মৌসুমের ৪৭ শতাংশে জমিতে ব্রি জাতের ধান চাষ হচ্ছে।

ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের উফশী জাতসমূহ

এক সময় নিয়মিত চাল আমদানি করত বাংলাদেশ। কিন্তু ব্রি'র আধুনিক জাত ও প্রযুক্তির কারণে ১৯৯০ সালের দিকে দেশ খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতার কাছাকাছি পৌঁছে যায়। বর্তমানে বাংলাদেশ চাল উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয়।

দেশে কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ব্রি'র অবদান

ধান গবেষণার পাশাপাশি কৃষি যান্ত্রিকীকরণেও ব্রি রেখেছে যুগান্তকারী অবদান। ফার্ম মেশিনারি এন্ড পোস্ট-হারভেস্ট টেকনোলজি (FMPHT) বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে কৃষিযন্ত্র উদ্ভাবন ও উন্নয়নে কাজ করছে। এ পর্যন্ত ৫০টিরও বেশি কৃষি যন্ত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ব্রি হেড-ফিড ও হোল-ফিড কম্বাইন হারভেস্টার, ওয়াকিং টাইপ ও রাইডিং টাইপ রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, গুটি ইউরিয়া ও পুন্ড ইউরিয়া এপ্লিকেটর, পাওয়ার উইডার, মিনি রাইস মিল, এয়ার-ফ্লো রাইস মিল, রাইস-ফ্লাওয়ার-স্পাইস মিল, সিড সোয়ার, অটো সিড সোয়ার, সোলার লাইট ট্রাপ ইত্যাদি। এসব কৃষিযন্ত্র কৃষকের শ্রম সাশ্রয় করছে, উৎপাদন খরচ কমাচ্ছে এবং সময়মতো চাষাবাদ নিশ্চিত করছে।

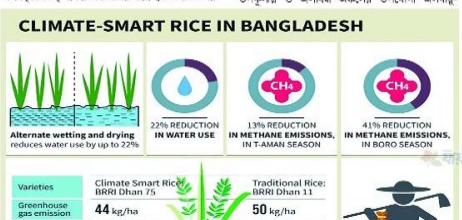

পোস্ট-হারভেস্ট পর্যায়ে কৃষকের ক্ষতি কমাতে ব্রি উদ্ভাবন করেছে মেকানিকাল ড্রয়ার, গ্রেইন কালেক্টর, হারমেটিক স্টোরেজ সিস্টেমসহ বিভিন্ন প্রযুক্তি। আগে ধান সংগ্রহ পর্যন্ত প্রায় ১০-১৫ শতাংশে পর্যন্ত ক্ষতি হতো। এখন ব্রি'র প্রযুক্তির কারণে সেই ক্ষতি অনেকাংশে কমে এসেছে। বাজারে ভালো মানের চাল পৌঁছাচ্ছে, কৃষকের আয় বাড়ছে। এ ছাড়া ধান চাষে মাটি-পানি-বালাই ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত ৩০০ এর অধিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে ব্রি।

ধানের জাত উদ্ভাবনে আঞ্চলিক কার্যালয় রাখছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

বর্তমান সারা দেশে ব্রি'র ১১টি আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে। বাংলাদেশের ক্রমহ্রাসমান আবাদযোগ্য জমি, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বর্ধিত জনসংখ্যার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (ব্রি) আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। স্থানভিত্তিক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে এই কার্যালয়গুলো খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে।

দেশের বিভিন্ন Agro-ecological zone অনুযায়ী ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়গুলো উচ্চ ফলনশীল, লবণাক্ততা, খরা ও বন্যা-সহিষ্ণু জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে-যেমন ব্রি ভাঙ্গা আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে উদ্ভাবিত ব্রি ধান২৮ ও ২৯, কুমিল্লা আঞ্চলিক কার্যালয় ব্রি ধান৩২, সাতক্ষীরা আঞ্চলিক কার্যালয় ব্রি ধান৪৭, রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয় ব্রি ধান৩৬ ও ৫৭ এবং বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয় জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু ব্রি ধান৭৭ ও ১০৬ ইত্যাদি। এসব জাত স্থানীয় কৃষি সমস্যার কার্যকর সমাধান দিয়েছে এবং জাতীয় উৎপাদনশীলতা বাড়িয়েছে।

স্থানভিত্তিক গবেষণাকে আরো জোরদার করতে ব্রি নতুন ছয়টি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করছে-কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল ও দিনাজপুরে। এগুলোর লক্ষ্য হলো- পাহাড়ি, হাওর, উপকূলীয় ও জলাবদ্ধ অঞ্চলের উপযোগী জলবায়ু-সহনশীল ধানের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

নতুন আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম হবে আরো বিকেন্দ্রীভূত, স্থানভিত্তিক ও ফলপ্রসূ। এতে টেকসই কৃষি ব্যবস্থা, খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

ব্রি জার্মপ্লাজম ব্যাংক

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (ব্রি'র) রাইস জার্মপ্লাজম ব্যাংক দেশের ধান গবেষণার মূল ভিত্তি।

বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া কিছু ধান

বাশফুল - সুবাসিত ও মাঝারি মেয়াদি আমন ধান, মধুপুর ও নেত্রকোনায় প্রচলিত ছিল।

গাবরাই - নিম্নভূমির আমন মৌসুমে চাষ হতো, বর্তমানে বিলুপ্ত।

ধোলা আমন - নিম্নাঞ্চলের প্রচলিত জাত, পানির নিচে সহনশীল কিন্তু এখন আর দেখা যায় না।

জিরা শাইল - সুবাসিত ও স্বল্প ফলনশীল বোরো ধান, বর্তমানে বিরল।

রাটা - উত্তরাঞ্চলে খরাসহিষ্ণু জাত ছিল, কিন্তু এখন আর চাষ হয় না।

চিনি আতপ - মিষ্টি স্বাদের আমন ধান, বিশেষ করে রাজশাহী ও পাবনায় ছিল জনপ্রিয়।

বিন্নি (কয়েকটি স্থানীয় ধরন) - ঐতিহ্যবাহী আঠাল চালের জাত, অনেক ধরন এরই মধ্যে বিলুপ্ত।

কাউন ধান - নিম্ন জলাবদ্ধ জমিতে চাষ হতো, বর্তমানে নেই।

বালাম (প্রাচীন সংস্করণ) এক সময় প্রিমিয়াম মানের চাল হিসেবে পরিচিত ছিল, বর্তমানে আধুনিক জাত দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

এই জাতগুলো শুধু খাদ্য নয়, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরও অংশ ছিল। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (ব্রি) এসব বিলুপ্তপ্রায় জাতের অনেকগুলো সংরক্ষণ করেছে তাদের রাইস জার্মপ্লাজম ব্যাংকে, যাতে ভবিষ্যতে জিনগত বৈচিত্র্য কাজে লাগানো যায়।

বর্তমানে ব্রি'র রাইস জার্মপ্লাজম সেন্টারে প্রায় ৯,৩৫০টি ধানের জার্মপ্লাজম সংরক্ষিত আছে, যার মধ্যে প্রায় ৭,৫০০টি স্থানীয় ও ঐতিহ্যবাহী জাত, ১,৮০০টি বিদেশি উৎস থেকে সংগৃহীত জাত এবং ৫০টির বেশি বন্য ও প্রজনন লাইন রয়েছে। এই জার্মপ্লাজমে লবণাক্ততা, খরা, বন্যা, শৈত্যসহিষ্ণু এবং সুগন্ধি জাতসহ বিশাল জিনগত বৈচিত্র্য বিদ্যমান। ব্রি বিজ্ঞানীরা এই জিনভাণ্ডার ব্যবহার করে ব্রি ধান ৪৭, ৫৬, ৫১, ৭১, ৮৭ ইত্যাদি সহনশীল ও উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছেন। জার্মপ্লাজমগুলো নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে –20°C তাপমাত্রায় সংরক্ষিত থাকে, যেটা দীর্ঘমেয়াদি জিন সুরক্ষা নিশ্চিত করে। আধুনিক জিনোমিক ও বায়োটেকনোলজিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্রি এই জার্মপ্লাজমকে ব্যবহার করছে ভবিষ্যতের জলবায়ু-সহনশীল ও পুষ্টি সমৃদ্ধ ধান উদ্ভাবনে। এভাবে ব্রি রাইস জার্মপ্লাজম ব্যাংক বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষি টেকসইকরণের মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করছে।

ব্রি কর্তৃক ধানের বিভিন্ন জাতসমূহ

দেশের অর্থনীতিতেও ব্রি'র অবদান অপরিসীম

একটি স্বতন্ত্র জরিপে দেখা যায়, ধান গবেষণা ও সম্প্রসারণে এক টাকা বিনিয়োগ থেকে ৪৬-৫৬ টাকা পর্যন্ত লাভ হচ্ছে। আধুনিক জাত ও প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ধান উৎপাদন বেড়েছে, খাদ্য আমদানি কমেছে, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়েছে। শুধু তাই নয়, কৃষি ও অকৃষি উভয় খাতেই কর্মসংস্থানের প্রসার ঘটেছে। আধুনিক সেচ, যান্ত্রিকীকরণ ও প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি গ্রামীণ অর্থনীতিকে করেছে গতিশীল। সার ব্যবসা, সেচযন্ত্র, পাম্প, যন্ত্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের মতো খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ফলে গ্রামীণ মানুষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

খাদ্য উৎপাদনে অবদান স্বরূপ স্বীকৃতি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট দেশে খাদ্য উৎপাদনে অবদান রাখায় এরই মধ্যে ২৭টির অধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে। স্বাধীনতা দিবস স্বর্ণপদক, রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক, বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার, জাতীয় কৃষি পুরস্কার, একুশে পদক ২০২২, স্মার্ট বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২৩সহ অসংখ্য স্বীকৃতি ব্রি'র ঝুলিতে জমা হয়েছে। এসব পুরস্কার শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের নয়, বরং বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষকের সম্মানের প্রতীক।

ব্রি'র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট এরই মধ্যে গ্রহণ করেছে 'রাইস ভিশন ২০৫০ এন্ড বিয়ন্ড'। এতে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ২০৩০ সালের মধ্যে ধানের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করা, ২০৪১ সালের মধ্যে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ২০৫০ সালের মধ্যে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণ। গবেষণার অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে অতি উচ্চ ফলনশীল জাত (১২-১৪ টন/হেক্টর), হাইব্রিড ও ট্রান্সজেনিক ধান, প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু জাত, অধিক ভিটামিন ও আয়রন সমৃদ্ধ পুষ্টি সমৃদ্ধ ধান এবং রফতানিযোগ্য সুগন্ধি জাত উদ্ভাবনে। একই সঙ্গে কৃষি যন্ত্রপাতির উন্নয়ন ও ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিকে স্মার্ট ও আধুনিক করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ব্রি আজ বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার প্রতীক। স্বাধীনতার সময় যে দেশ খাদ্যে ঘাটতিগ্রস্ত ছিল, সেই দেশ আজ ধানে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় উৎপাদনকারী। এই পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি হলো ব্রি'র নিরলস গবেষণা, বিজ্ঞানীদের উদ্যম এবং কৃষকদের হাতে প্রযুক্তি পৌঁছে দেয়ার অঙ্গীকার।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কৃষি এখন অনেকাংশে নির্ভর করছে ব্রি'র গবেষণা ও উদ্ভাবনের ওপর। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতা-এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ব্রি এরই মধ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, উন্নত জাত, ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং জলবায়ু সহনশীল গবেষণা ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে খাদ্যে আরো শক্তিশালী করে তুলবে।

খাদ্যে স্বনির্ভরতার সংগ্রাম থেকে শুরু করে কৃষিকে আধুনিক ও যান্ত্রিকীকরণে রূপান্তরের প্রতিটি পদক্ষেপে ব্রি'র অবদান স্পষ্ট। বলা যায়, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট কেবল একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান নয়, বরং এটি হলো খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষকের উন্নয়ন এবং জাতীয় সমৃদ্ধির মেরুদণ্ড। আগামী দিনের বাংলাদেশকে টেকসই ও সমৃদ্ধ করার লড়াইয়ে ব্রি তাই আমাদের সবচেয়ে বড় ভরসা।

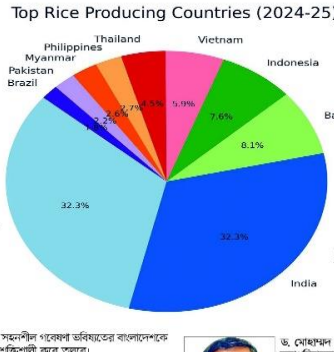

বিশ্বে ধান উৎপাদনে দেশসমূহ

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ব্রি রাইস মিউজিয়াম

ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট

ব্রি দেশে ধানের জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে দীর্ঘমেয়াদে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, জাত উদ্ভাবনে বৈজ্ঞানিক মানসম্পন্ন প্রজনন, উচ্চ ফলনশীলতা, রোগ ও দুর্যোগ সহনশীলতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি সহনশীলতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ ছাড়াও উদ্ভাবিত জাতসমূহের কৃষকপর্যায়ে প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে সম্প্রসারণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে।

ড. মো. আনোয়ার হোসেন
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
এফএমপিএইচটি বিভাগ।

ব্রি শুধু ধানের জাত উদ্ভাবনেই নয়, কৃষি যান্ত্রিকীকরণেও যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। আমাদের উদ্ভাবিত ট্রান্সপ্লান্টার, কম্বাইন হারভেস্টার, মিনি রাইস মিল ও ইউরিয়া এপ্লিকেটর কৃষকের শ্রম ও খরচ কমাতে সক্ষম। ভবিষ্যতে আমরা কৃষিকে আরো আধুনিক, স্মার্ট ও ডিজিটাল করতে উন্নত যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন অব্যাহত রাখব। কৃষি যান্ত্রিকীকরণই হবে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তার মূল ভিত্তি।

ড. মো. নজমুল বারী
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
কীটতত্ত্ব বিভাগ

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ধানক্ষেতের ২৩২ ধরনের ক্ষতিকর পোকা এবং ৩৭৫ ধরনের উপকারী পোকা শনাক্ত করেছে ব্রি'র কীটতত্ত্ব বিভাগ। যার মধ্যে ২০-৩৩ ধরনের পোকা বিভিন্ন বছরে, মৌসুমে ও অঞ্চলে ধানের জন্য বিশেষ ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এর সঙ্গে ব্রি কীটতত্ত্ব বিভাগের বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পোকার বিপরীতে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের অর্থনৈতিক ক্ষতির দ্বারপ্রান্ত নির্ণয় করেছেন। অর্থনৈতিক ক্ষতির দ্বারপ্রান্ত থেকে কৃষক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন কখন তার জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। এতে করে পরিবেশের ক্ষতির পাশাপাশি কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ২৩/১১/২০২৫ (পৃষ্ঠাঃ০৭)

গোপালগঞ্জ : চাষ হওয়া ব্রি ধান-১০৩-এর খেত —ইত্তেফাক

আমনে নতুন আলো ‘ব্রি ধান-১০৩’

উৎপাদন খরচ কম

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের বৈজ্ঞানিক সহকারী আব্দুল্লাহ আল মোমিন জানান, এ জাতটি রোপা আমন মৌসুমে বৃষ্টিনির্ভর চাষাবাদ উপযোগী

■ **গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি**

গোপালগঞ্জে আমন সৌসুমে সবচেয়ে বেশি ফলন দিয়েছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল ধানের নতুন জাত ব্রি ধান-১০৩। স্বল্প জীবনকালসম্পন্ন এ ধানের জাতে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়েছে। তাই ধান উৎপাদনে খরচ সাশ্রয় হয়। এ জাতটি বিদ্যমান জাতের তুলনায় বিঘাপ্রতি চার থেকে পাঁচ মণ বেশি ফলন দিয়েছে। খড়ের উৎপাদনও বেশ ভালো। এ কারণে প্রতি বছর গোপালগঞ্জে এ জাতের ধানের আবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান ও চিফ সাইন্টিফিক অফিসার ড. আমিনা খাতুন এ তথ্য জানিয়েছেন।

ঐ কর্মকর্তা বলেন, ‘আমরা ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি ও দেশের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতে ব্রি উদ্ভবিত উচ্চফলনশীল এবং হাইব্রিড ধান নিয়ে গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট ও নড়াইল জেলায় কাজ করছি। চলতি আমন মৌসুমে তিন জেলায় ব্রি ধান-১০৩-এর প্রদর্শনী প্লট করা হয়। গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ঘোনাপাড়া গ্রামের কৃষক মো. আরজ আলী খন্দকারের জমিতে উৎপাদিত ধান কেটে পরিমাপ করে দেখা গেছে প্রতি বিঘায় (৩৩ শতাংশ) এ ধান ২২ মণ ফলন দিয়েছে। বাগেরহাট ও নড়াইল জেলায় এ ধান আশানুরূপ ফলেছে। তাই আমন মৌসুমে দেশের ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষকের আর্থসামাজিক অবস্থার বিপ্লব ঘটিয়ে চলেছে ব্রি ধান১০৩।

ব্রি গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রিন্সিপাল সাইন্টিফিক অফিসার ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, ব্রি ধান-১০৩ জাতে আধুনিক উফশী ধানের সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ধানের দানা লম্বা ও চিকন। ১ হাজারটি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৩ দশমিক ৭ গ্রাম। এ ধানের প্রোটিন ও অ্যামাইলোজের পরিমাণ যথাক্রমে ৮.৩ শতাংশ এবং ২৪ শতাংশ। প্রতি হেক্টরে এ জাতটির গড় ফলন ৬.২ টন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে প্রতি হেক্টরে ৭.৯৮ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। এ জাতের গড় জীবনকাল ১৩০ দিন (১২৮-১৩৩ দিন)। ২০২২ সালে এ ধানের জাত অবমুক্ত করা হয়। গোপালগঞ্জ, নড়াইল ও বাগেরহাটে ২০২৩ সাল থেকে এ ধানের চাষাবাদ হয়ে আসছে।

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের বৈজ্ঞানিক সহকারী আব্দুল্লাহ আল মোমিন জানান, এ জাতটি রোপা আমন মৌসুমে বৃষ্টিনির্ভর চাষাবাদ উপযোগী। এ ধানের চাষাবাদ অন্যান্য উফশী রোপা আমন ধানের মতোই। বীজ বপনের উপযুক্ত সময় ১৫ জুন থেকে ৭ জুলাই পর্যন্ত। সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতোই। এ ধানের জাতে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ নেই বললেই চলে। তাই ধান উৎপাদনে খরচ সাশ্রয় হয়। গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোবরা ইউনিয়নের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা রাজ কুমার রায় বলেন, ইতিমধ্যে কৃষকদের কাছে এ ধানটি জনপ্রিয় জাতে পরিণত হয়েছে।

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ঘোনাপাড়া গ্রামের কৃষক মো. আরজ আলী খন্দকার বলেন, আগে স্থানীয় আমনে বিঘায় চার/পাঁচ মণ ফলন পেতাম। সময় লাগত ১৮০ দিন। পরে কৃষি বিভাগের পরামর্শে আমানের উফশীসহ অন্যান্য জাত করেছি। সেখানে বিঘায় ১৮/২০ মণ ফলন পেয়েছিলাম। ২০২৩ সালে প্রথম এ ধানের আবাদ করি। তারপর থেকে এ ধানের আবাদ অব্যাহত রেখেছি। এ বছর ব্রি ধান১০৩ করে বিঘায় ২২ মণ ধান পেয়েছি। সময় লেগেছে ১৩০ দিন। এ ধানের পোকার আক্রমণ হয়নি। সেচ খরচ লাগেনি। ফলনও দুই থেকে চার মণ বেশি পেয়েছি। কম খরচে বেশি ধান পেয়ে লাভবান হয়েছি। এ ধান কাটার পর একই জমিতে বছরে তিন থেকে চারটি ফসল করতে পারছি।